কচুরি পানা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রাপ্তিস্থান—
গ্লোব নার্শারি,
শ্যামবাজার, কলিকাতা

Library
23/3, B. C. Road

মূল্য আট আনা

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY
Date
Accn. No.

S.C.E.R.T., W.B. LIBRARY
Date 18.6.05
Accn. No. 11390

ভূমিকা

রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের "কচুরিপানা" পুস্তিকা আমি পাঠ করিয়াছি। কচুরিপানা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তিনি অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার অপকারিতার প্রতি জনসাধারণের মনঃযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রচার-পুস্তিকা হইলেও সাহিত্যের রস ইহাতে রহিয়াছে। সহজ-সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতায় লেখক অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকেও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। শিক্ষিত সাধারণের নিকট এবং বিশেষ করিয়া যাঁহারা পল্লী অঞ্চলের আবহাওয়ার বিশুদ্ধতা রক্ষায় আগ্রহশীল তাঁহাদের নিকট এই পুস্তিকা যোগ্য সমাদর লাভ করিবে। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

২৩।৩।৪২

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

কচুরিপানা বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক দিন হইতে অনেক চেষ্টাই চলিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বিশেষ কোনো স্থায়ী ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ কচুরিপানা সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানের অভাব। কচুরিপানা সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে কচুরিপানা সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া উহার বিনাশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে; কচুরিপানা কিরূপে জন্মায়, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে কিরূপে বংশ বিস্তার করে, কোথায় কি উপায় অবলম্বন করিলে উহাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার নিবারণ করা যায়, কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ সময় কিরূপভাবে ধ্বংস কার্য্য করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে জানা দরকার।

তবে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, "কচুরিপানা" পুস্তিকায় 'তোলো আর মারো' ছাড়া নূতন কথা কিছুই নাই; কারণ কচুরিপানা বিনাশের জন্য বর্ত্তমানে আমাদিগকে এই 'তোলো আর মারো' প্রণালীর উপরই নির্ভর করিতে হইবে। এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলেও যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার, তাহাই দেশের ও দশের মধ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে; ইহা ভিন্ন কচুরিপানা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে কিছু কিছু আছে।

বলা বাহুল্য এই পুস্তিকা প্রণয়নে আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নাই। সরকারী রিপোর্টসমূহ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেগুলি যতদূর সম্ভব সাজাইয়া সাধারণের বোধগম্য সহজ ও সরল ভাষায় এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই পুস্তিকার কয়েকখানি ছবিও সরকারী রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিবার জন্য জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম "কচুরিপানার গান" এবং স্নেহভাজন শ্রীমান পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় "কচুরিপানার ছড়া" রচনা করিয়া দিয়াছেন; এইজন্য তাঁহাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আশা করি প্রচারকার্য্যের জন্য গান ও ছড়াটি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইবে।

আমার দুই কন্যা কুমারী মল্লিকা ও কুমারী যূথিকার উৎসাহ ও সাহায্যেই এই পুস্তিকা রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

পরিশেষে মাননীয় অর্থসচিব শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, ডি-লিট্ মহোদয়কে আমার আন্তরিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা না জানাইলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। তাঁহার সময়ের অভাব যে কত তাহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া এবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় পল্লী সংগঠন বিভাগ,
কলিকাতা
২৫শে মার্চ, ১৯৪২

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সূচী

কচুরিপানার গান	...	...	১
কচুরিপানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	...	...	২
কচুরিপানা গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ	...	...	৪
কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার	...	...	৬
কচুরিপানার দ্বারা দেশের অনিষ্ট	...	...	১১
অন্যান্য দেশে কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা		...	১৫
বাংলা দেশে কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা		...	১৮
কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার নিবারণ এবং উহা সমূলে ধ্বংসের উপায়	...	...	২১
কচুরিপানা আইনের মোটামুটি কথা	...	...	২৯
কচুরিপানার অন্যান্য ব্যবহার	...	...	৩৩
কচুরিপানা ধ্বংসের জন্য প্রচার কার্য্য	...	...	৩৪
কচুরিপানার ছড়া	...	...	৩৬

কচুরিপানা

গান

(কাজী নজরুল ইস্‌লাম)

ধ্বংস কর এই কচুরিপানা !
(এরা) লতা নয়, পরদেশী অসুর-ছানা ॥
ইহাদের সবংশে কর কর নাশ,
এদের দগ্ধ ক'রে কর ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশ্‌মন্, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা ॥
(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক,
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক।
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা,
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা ॥
(এরা) বাঙ্‌লার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ,
(এস) সমূলে কচুরিপানা ক'রে ফেলি সাফ্ !
(এরা) শ্যামল বাঙ্‌লা দেশ করিল শ্মশান,
(এরা) শয়তানী দূত দুর্ভিক্ষ-আনা ॥
কাল— সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়,
(এরা) রক্ত বীজের ঝাড়, মরিতে না চায় !
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই,
(এরে) নির্ম্মূল ক'রে ফেল, মেন না মানা ॥

কচুরিপানার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্ম্মানী দেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে কচুরিপানার বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইয়াছে; সেই জন্য মনে হয়, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কচুরিপানার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু কচুরিপানার আদি জন্মস্থান জার্ম্মানী দেশ নহে; দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল ও ভেনিজুয়েলা নামক এই দুই প্রদেশে ইহা প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল।

কচুরিপানার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহার ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্যই অনেক দেশে ইহা মানুষের দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং তাহার ফলে ইহা যে কেবল সেই সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, অন্যান্য দেশেও প্রবেশ লাভ করিয়া উহার বংশবৃদ্ধি করিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উহার ফুলের বাহারে আকৃষ্ট হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ফ্লোরিডা দেশের অনেকে নিজেদের বাড়ীর সম্মুখে সেণ্টজন নদীতে কচুরিপানার গাছ প্রথমে আনয়ন করেন; ইহার দ্বারা কচুরিপানা ঐ দেশে ক্রমশঃ এত ছড়াইয়া পড়ে যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উহা সেখানকার এক অতি অনিষ্টকর "উৎপাত" বলিয়া পরিগণিত হয়। ফ্লোরিডা হইতে উহা ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; ১৮৯৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে, ১৯০৮ সালে কোচিন চীনে এবং ১৯১৩ সালে ব্রহ্মদেশে ইহা সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই সকল দেশ ছাড়া ইহা ঐ সময়ে সুমাত্রা, যাভা, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

১৯১৪ সালে বাংলা দেশে কচুরিপানা ব্যাপকভাবে প্রথমে দেখা দেয় এবং উহার দ্বারা যে দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, ঐ সময়েই তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব্বেই যে অনেক স্থানের খাল, নালা ইত্যাদি

কচুরিপানার দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে নৌকা চলাচলের অসুবিধা হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়; বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন যে, ১৯০৮ সালে ঢাকা জেলার ষোলঘর গ্রামের খাল কচুরিপানার দ্বারা এত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে উহাতে নৌকা চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় যুবক সমিতি মাঝে মাঝে ঐ খাল হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া ঐ খাল পরিষ্কার করিতেন; ক্ষিতীশবাবুও এই কাজ নিজ হস্তে করিয়াছেন। কচুরিপানা এ দেশে ঠিক কখন প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না; তবে রয়েল বোটানিক গার্ডেনের খাতা-পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯০২ সাল হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী দমদম, এবং হাওড়ার নিকটবর্ত্তী লিলুয়া প্রভৃতি স্থানে রেল লাইনের উভয় দিকের খানা খন্দে কচুরিপানা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এমন কি নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমার কোম্পানীর জয়েণ্ট এজেণ্ট মিষ্টার এ, এল, গডেন বলেন যে, ষ্টীমার কোম্পানীর পুরাতন খাতা পত্রে উল্লিখিত আছে ১৮৯৮ কি ১৮৯৯ সালে বাংলা দেশের তখনকার ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ষ্টীমারযোগে যখন বিলপথে যাইতেছিলেন, তখন ঘন কচুরিপানার জন্য তাঁহার ষ্টীমার চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহা পরিষ্কার করিয়া তবে ষ্টীমার চালাইতে পারা গিয়াছিল।

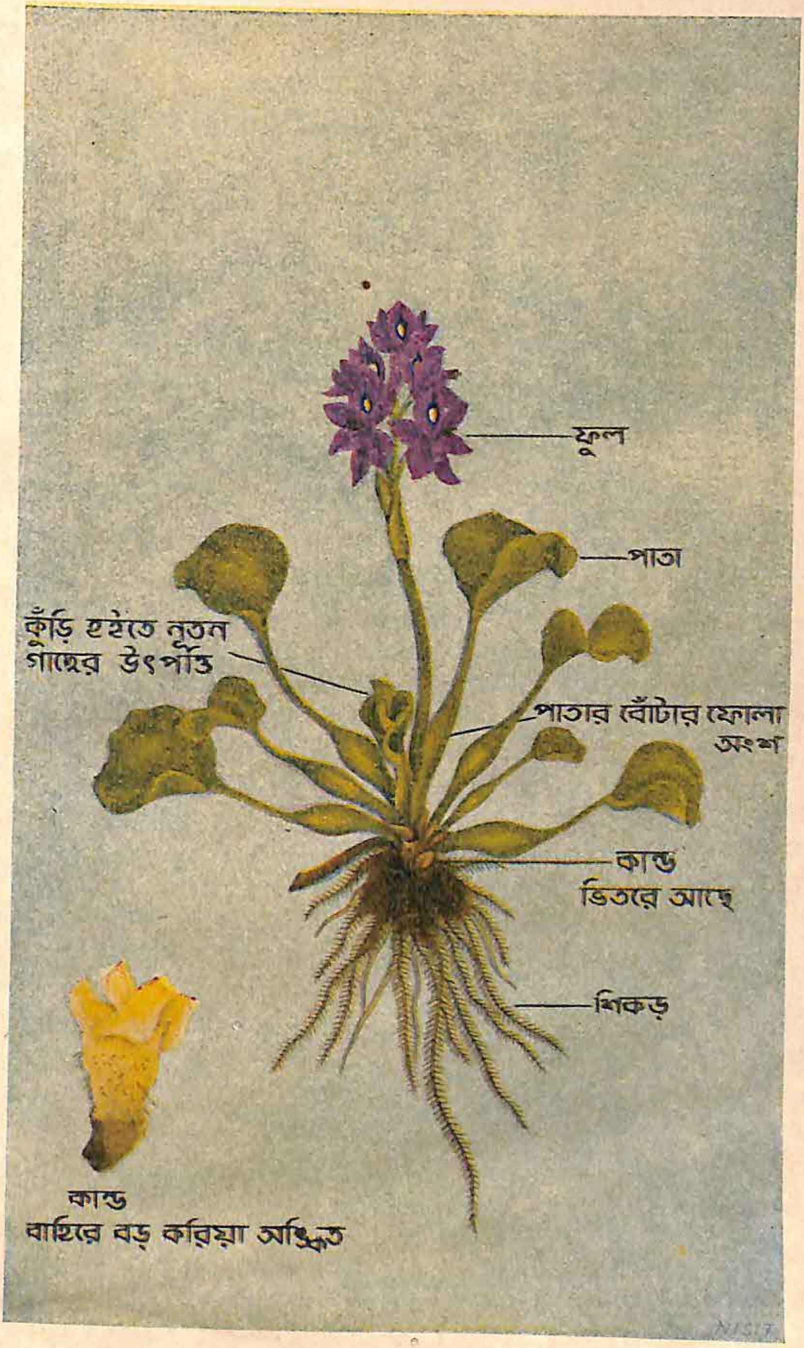
কচুরিপানাকে স্থানে স্থানে "মর্গ্যান পানা" এবং "জার্ম্মান পানা" বলে; এই দুই নামের পশ্চাতেও একটু ইতিহাস আছে। নারায়ণগঞ্জে জর্জ মর্গ্যান নামে এক সাহেব নাকি কচুরিপানার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ১৯০৫ কিম্বা ১৯০৬ সালে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিগঞ্জের কোনো পুষ্করিণী হইতে উহার কয়েকটি গাছ সংগ্রহ করিয়া নারায়ণগঞ্জে তাঁহার পুষ্করিণীতে প্রথম স্থাপিত করেন, এবং তথা হইতেই উহা বংশ বিস্তার করিয়া প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে এবং পরে সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য অনেকে ইহাকে এখনও 'মর্গ্যান সাহেবের বোকামি' আখ্যা দিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিগত ১৯১৪ সালে কচুরিপানা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই ইহা আমাদের অনেক প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতেছে; ১৯১৪ সালে জার্ম্মানীর সহিত ইংরাজদের যে মহাযুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং আমাদের আরও ক্ষতি করিবার জন্যই যে জার্ম্মান দেশের লোকেরা আমাদের দেশে কচুরিপানা ছড়াইয়া দিয়াছিল, অনেক পল্লীবাসীর মনে এই ধারণা জন্মায় এবং তাহার ফলে "জার্ম্মান পানা" নাম প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার অনেকের মতে কচুরিপানার বৈজ্ঞানিক নাম জার্ম্মান দেশের এক মন্ত্রীর নামের সহিত জড়িত আছে বলিয়া উহার নাম "জার্ম্মান পানা" হইয়াছে।

কচুরিপানা গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশ

কচুরিপানা জলজ উদ্ভিদ এবং সাধারণতঃ ইহা জলেই ভাসে ; তবে ইহা ডাঙ্গায় স্যাঁতসেঁতে ও ভিজা এবং কাদা মাটিতেও জন্মে। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদের ন্যায় কচুরিপানার গাছেরও পাঁচটি অংশ আছে যথা (১) শিকড়, (২) কাণ্ড, (৩) পাতা, (৪) ফুল এবং (৫) ফল। প্রথম চিত্রে এই সকল অংশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইবে।

সচরাচর জলজ উদ্ভিদের অর্থাৎ পানা জাতীয় গাছের যেমন সরু সরু লম্বা লম্বা অনেক শিকড় থাকে, কচুরিপানা গাছেরও সেইরূপ শিকড় আছে ; স্বাভাবিকরূপে কাণ্ডের নিম্নভাগ হইতেই শিকড়গুলি বাহির হয়, এবং শিকড়গুলির চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট অসংখ্য সোঁয়া থাকে ; কচুরিপানার গাছ যখন জলে ভাসে, উহার ফুল ফুটিবার সময় জলের গভীরতা এমন কি দুই হাতের উপর হইলেও উহার শিকড়গুলি জলের নীচে চলিয়া যায় এবং মাটিতে প্রবেশ করে ; ইহা অপেক্ষা জলের গভীরতা বেশী হইলে শিকড়গুলি জলেই ভাসিতে



কচুরিপানার বিভিন্ন অংশ সমূহ

থাকে। যে সকল পানা ডাঙ্গায় কাদা মাটিতে উৎপন্ন হয় তাহাদের শিকড় স্বাভাবিক ভাবে মাটির মধ্যে চলিয়া যায়।

কচুরিপানার কাণ্ড খুব ছোট; যখন জলে উৎপন্ন হয়, কাণ্ডটি জলের নীচে থাকে, ডাঙ্গায় উৎপন্ন হইলে উহা প্রায় মাটির মধ্যেই থাকে। কাণ্ডটির উপরিভাগে চারিদিক হইতে পাতা বাহির হয় এবং কাণ্ডটি পাতাগুলির গোড়ার দ্বারা ঢাকা থাকে। কচুরিপানার পাতার বোঁটা বা ডাঁটা খুব লম্বা এবং উহার ফলকও খুব চওড়া; যে সকল কচুরিপানা জলে ভাসে তাহাদের পাতার বোঁটা বায়ুপূর্ণ 'ব্লাডারের' ন্যায় ফাঁপা হয়; ইহার জন্য কচুরিপানা অতি সহজে জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে; যে সকল কচুরিপানা ডাঙ্গায় কাদায় উৎপন্ন হয়, তাহাদের পাতার বোঁটা এরূপ ফাঁপা হয় না।

কচুরিপানার গাছের অগ্রভাগে একটি লম্বা দণ্ডের উপর উহার ফুল বাহির হয়; একটি দণ্ডে সাধারণতঃ ৮টি হইতে ১৪টি ফুল হয়; ফুলগুলির বোঁটা থাকে না; সাধারণতঃ প্রত্যেক গাছের ফুলের চারিটি অংশ থাকে, যথা পুষ্পচ্ছদ (যাহা ফুলের পাপড়িগুলির তলদেশ ঘিরিয়া থাকে), পুষ্পমুকুট (সাধারণ কথায় যাহাকে ফুলের পাপড়ি বলে) পুরুষ কেশর এবং স্ত্রী কেশর বা গর্ভকেশর। কচুরিপানার ফুলের পুষ্পচ্ছদ ও পুষ্পমুকুটের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

যেমন সব ফুলেরই পুরুষ কেশরের পরাগ বা রেণু গর্ভকেশরে প্রবেশ করিলে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, কচুরিপানার ফুলেও তাহাই হয়; সাধারণতঃ মৌমাছি জাতীয় পতঙ্গ এবং বাতাসের দ্বারাই পুরুষ কেশরের রেণু গর্ভকেশরে স্থানান্তরিত হয়। এক একটি ফলে অনেকগুলি বীজ থাকে; ফলের এবং বীজের আকার খুব ছোট এবং বীজের আবরণ খুব শক্ত হয়। এই সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হইবে।

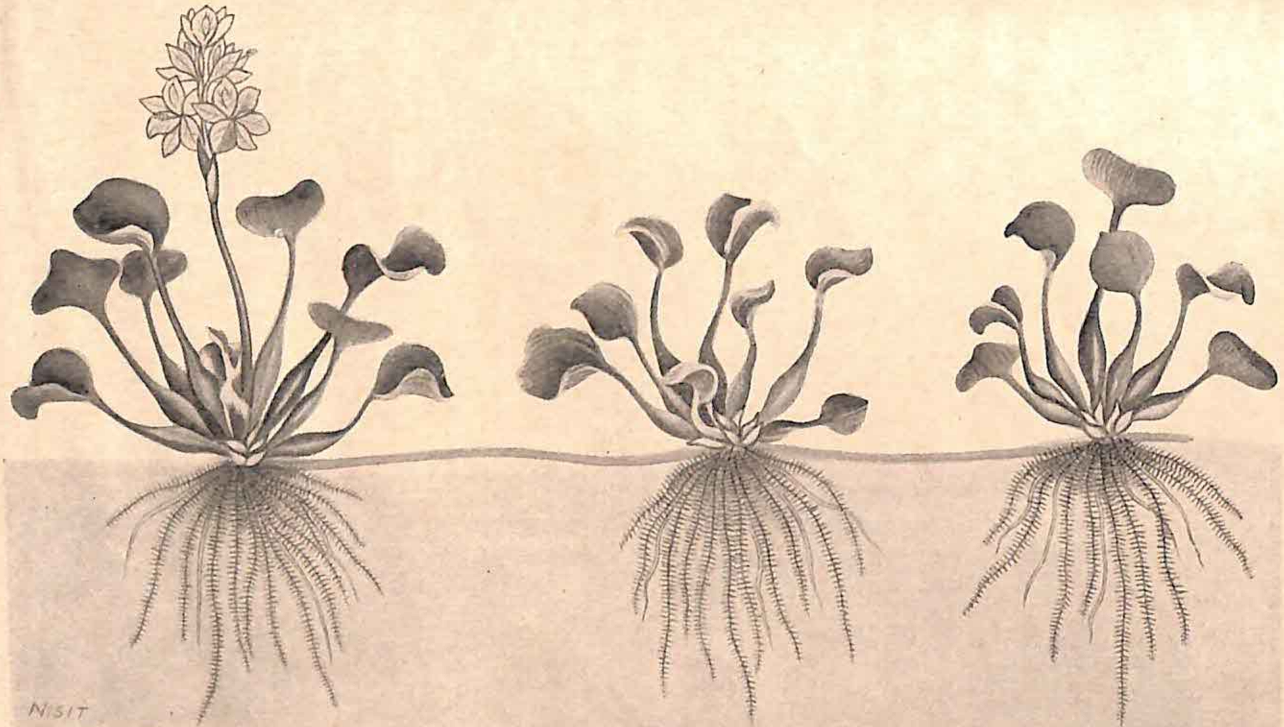
কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার

যেমন অনেক প্রকারের স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদের বীজ এবং কাণ্ড, উভয় অংশ হইতেই নূতন গাছ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কচুরিপানারও বীজ এবং কাণ্ড হইতে নূতন গাছ জন্মে ; তবে যে সকল কচুরিপানা জলে ভাসে তাহাদের কাণ্ড হইতেই অতি অধিক ও দ্রুত গতিতে নূতন গাছ জন্মে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার জন্য বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণেই নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। এই স্থলে ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সাধারণতঃ যে সকল গাছের কাণ্ড হইতে অধিক পরিমাণে নূতন গাছ জন্মায় তাহাদের বীজ কম উৎপন্ন হয়।

কাণ্ড হইতে কি ভাবে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়

কচুরিপানার গাছের কাণ্ডের সহিত উহার পাতাগুলি যেখানে সংলগ্ন থাকে, এইরূপ প্রত্যেক স্থান অর্থাৎ গাঁট হইতে একটি ছোট কুঁড়ি বাহির হয় ; ইহা ফুলের কুঁড়ি নহে ; একটি নূতন গাছের কুঁড়ি, অর্থাৎ এই কুঁড়িটি ফুটিলে উহা হইতে একটি নূতন ও পৃথক গাছ উৎপন্ন হয় ; কুঁড়িটি প্রথম যখন বাহির হয়, উহার জন্মস্থানে অর্থাৎ পাতার ও কাণ্ডের সংযোগ স্থলেই আটকাইয়া থাকে ; কিন্তু কুঁড়িটি ক্রমশঃ যখন বড় হইতে থাকে, তখন উহার একটি বোঁটা হয়, এবং বোঁটাটি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা হয় ; ইহার ফলে কুঁড়িটি বোঁটা সমেত কচুরিপানার মূল-গাছ হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং খুব শীঘ্র শীঘ্র বড় হইতে থাকে ও উহা হইতে কাণ্ড ও পাতা বাহির হয়। বোঁটার দ্বারা কুঁড়িটি যখন মূল গাছ হইতে দূরে সরিয়া যায়, তখন উহার তলদেশ হইতে শিকড়ও বাহির হয় ; পরে মূল গাছ হইতে বোঁটাটি ভাঙ্গিয়া গেলে, উহা শিকড় কাণ্ড ও পত্রগুচ্ছ সমেত একটি পৃথক নূতন গাছে পরিণত হয়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দেখা যাইবে। এক একটি কচুরিপানা গাছের কাণ্ডের চারিদিকে

দ্বিতীয় চিত্র



কাণ্ডের ও পাতার সংযোগ স্থলের কুঁড়ি হইতে নূতন গাছের জন্ম

কাণ্ড ও পাতার সংযোগ স্থলে কুঁড়ি উৎপন্ন হয় এবং উহারা প্রত্যেকে উপরোক্ত ভাবে এক একটি পৃথক গাছে পরিণত হয় ও জলে ভাসিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কচুরিপানা যখন জলে ভাসে তখন উহার পাতার ডাঁটা বায়ুপূর্ণ "ব্ল্যাডারের" মত স্ফীত আকারের হয় এবং সেই জন্য উহা জলে অনায়াসে আশ্চর্য্যরূপে ভাসিতে পারে ; উহার চওড়া পাতাও নৌকার পালের মত কাজ করে ; সুতরাং একটু বাতাসে কিম্বা স্রোতে উপরোক্ত ভাবে উৎপন্ন এক একটি গাছ অনায়াসেই বহুদূরে ভাসিয়া যাইতে পারে এবং যেখানে ভাসিয়া যায়, সেখানে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই ভাবে কচুরিপানার বংশ বিস্তার এত দ্রুত গতিতে হয় যে, কচুরিপানার কাণ্ডের একটি ছোট্ট টুকরা বা অংশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে দশহাজার বর্গগজ ব্যাপী কচুরিপানার ঘন দল সৃষ্টি হইতে পারে।

কচুরিপানার কাণ্ড বৃষ্টিশূন্য বা নীরস আবহাওয়া অনায়াসে দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারে ; এইরূপ নীরস আবহাওয়ায় কাণ্ডটি মরিয়া গিয়াছে মনে হইলেও উহার জীবনীশক্তি বেশ সতেজ থাকে এবং অল্প একটু রস পাইলেই উহা হইতে আবার নূতন গাছ জন্মে।

বোঁটা ভাঙ্গিয়া যে সকল নূতন গাছ মূল গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না, তাহারাও মূল গাছটিকে ঘিরিয়া উপরোক্ত ভাবে বংশ বিস্তার করিতে থাকে এবং ইহার ফলে মূল গাছের চারিদিকে এত ঘন কচুরিপানার গাছ জন্মায় যে, অবশেষে মূল গাছটি চাপা পড়িয়া মরিয়া যায়। এইরূপ ঘন কচুরিপানার দলও একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভাসিয়া যায় এবং যেখানে যায় সেখানে উহা বংশ বিস্তার করিতে থাকে।

বীজ হইতে কি প্রকারে বংশ বৃদ্ধি হয়

সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার কচুরিপানার ফুল হয়। একবার চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের শেষ পর্য্যন্ত, আর একবার শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ; তবে বর্ষার সময়েই উহার ফুল অতি অধিক পরিমাণে ফুটিয়া থাকে ;

আবার কোনো কোনো স্থানে কখনও কখনও বৎসরের অন্য সময়েও ইহার ফুল হয়। ভোর বেলায় সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে ; মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে একটু দেরীতে ফোটে। ফুলগুলি ফুটিবার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুকাইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গাছের অগ্রভাগে একটি দণ্ডের উপর কচুরিপানার ফুল উৎপন্ন হয়। জলের উপরে ফুলের পুরুষ কেশরের পরাগ গর্ভ কেশরে প্রবেশ করিলে এবং ফুলগুলি শুকাইয়া যাইবার পর, ফুল সমেত দণ্ডটি বাঁকিয়া জলের নীচে চলিয়া যায় এবং জলের গভীরতা কম হইলে কিম্বা ডাঙ্গায় কাদা মাটিতে উৎপন্ন হইলে উহা মাটিতে ঢুকিয়া যায়। জলের নীচেই ফুল হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়। দণ্ডের সব ফুলের পরাগ গর্ভ কেশরের সহিত মিশ্রিত হয় না, আবার যাহাদের হয় তাহাদের মধ্যে অনেক ফুল হইতে ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না এবং আবার সব ফলের সকল বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না। যদিও সাধারণতঃ জলের নীচেই ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও উপযুক্ত আবহাওয়ায় জলের উপরেও ফুল হইতে ফল ও বীজ জন্মায়।

জলের নীচে ফলগুলি পাকিয়া যখন ফাটিয়া যায়, উহাদের ভিতরের বীজ জলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং বীজগুলি জলের অপেক্ষা ভারী বলিয়া জলের নীচে মাটিতে যাইয়া পড়ে। এই স্থলে মনে রাখা দরকার যে, বৃষ্টিপাত ও বায়ুর আর্দ্রতার উপর কচুরিপানার ফুল হইতে ফল ও বীজ উৎপাদন নির্ভর করে এবং বৎসরের যে কোনো সময় ফুল ফুটুক না কেন, বাংলা দেশে সাধারণতঃ কেবল আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যে সকল ফুল ফোটে, সেই সকল ফুল হইতেই ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়।

কচুরিপানার বীজ অন্ততঃ ছয় মাস নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে অর্থাৎ উপযুক্ত আবহাওয়াতেও ছয় মাসের মধ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হয় না ; ছয় মাসের পরও যে ইহা হইতে অঙ্কুর বাহির

হইবে সে সম্বন্ধেও কোনো নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত আলো, উত্তাপ, বাতাস ও রস পাইলেই ইহা অঙ্কুরিত হয় ; কিন্তু ইহা জলের নীচে মাটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলিয়া সহজে উপযুক্ত আলো, বাতাস, উত্তাপ ও রস পায় না ; তবে কচুরিপানার বীজের জীবনীশক্তি খুব বেশী ; ইহা মাটির মধ্যে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাপা পড়িয়া থাকিলেও ইহার জীবনীশক্তি নষ্ট হয় না ; অর্থাৎ উপযুক্ত আলো, বাতাস, উত্তাপ ও রস পাইলে পাঁচ বৎসরের পুরাতন বীজ হইতেও নূতন গাছ উৎপন্ন হইতে পারে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের পর বীজের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

কচুরিপানার বীজের শক্ত আবরণের জন্য এবং উহা যখন জলের নীচে মাটির মধ্যে থাকে, তখন উহার মধ্যে প্রধানতঃ উপযুক্ত পরিমাণ বাতাস ঢুকিতে পারে না বলিয়াই উহা হইতে সহজে অঙ্কুর বাহির হয় না ; খোলা জায়গায় বীজ শুষ্ক হইবার পর খোলা বাতাস, উপযুক্ত রস ও উত্তাপ পাইলে উহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়।

যে সকল জলাশয়ে কচুরিপানা উৎপন্ন হয়, গ্রীষ্মকালে সেই জলাশয়গুলি যখন একেবারে শুকাইয়া যায়, উহাদের মাটির উপরিভাগে যে সকল বীজ পড়িয়া থাকে সেই সকল বীজও শুকাইয়া যায় এবং তখন বীজের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ বাতাসও প্রবেশ করে ; তাহার পর বৃষ্টি হইলে মাটি ধুইয়া বীজ আরও অনাবৃত হইয়া পড়ে এবং আরও শুকাইয়া যায় ; এবং পরে উপযুক্ত রস পাইয়া উহা অঙ্কুরিত হয়। মাটির নীচে যে সকল বীজ পড়িয়া থাকে তাহারা এইরূপ শুকাইয়া যায় না এবং উপযুক্ত আলো ও বাতাসের অভাবে অঙ্কুরিত হয় না। এই স্থলে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, মাটির তলদেশের বীজগুলি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং উহারা বৎসরের পর বৎসর ক্রমে ক্রমে যখন জলাশয়ের মাটির উপরিভাগে আসে এবং জলাশয় যখন শুকাইয়া যায় তখন উহারা অঙ্কুরিত হয় ; এই কারণে বীজ হইতে চারা গাছের জন্ম সম্বন্ধে

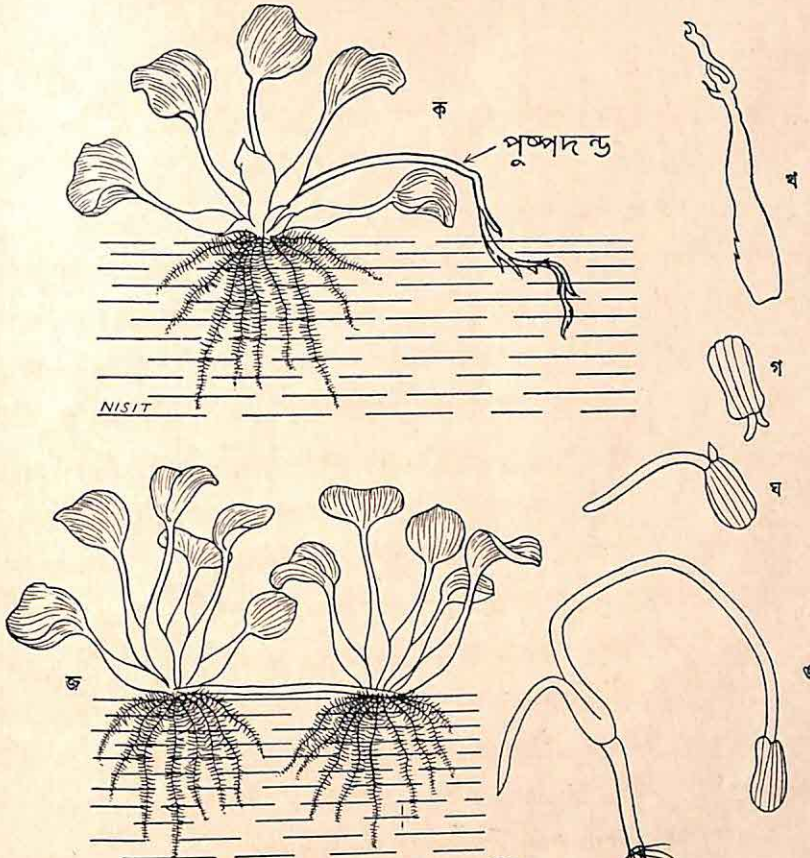
দীর্ঘকাল সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। তৃতীয় চিত্রে বীজ হইতে নূতন গাছের জন্ম দেখা যাইবে।

যে সকল জলাশয়ের পাড় খুব উঁচু ও খাড়া উহারা বৃষ্টির জলে শীঘ্রই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই সকল জলাশয়ের তলদেশের মাটিতে আবদ্ধ বীজ হইতে চারা গাছ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় না; কারণ তখন বীজগুলি আবার অধিক পরিমাণ জলের তলায় ঢাকা পড়ে এবং উপযুক্ত বাতাস পায় না। যে সকল জলাশয়ের পাড় ঢালু, সেই সকল জলাশয়ে বৃষ্টির জল ছড়াইয়া পড়ে এবং তত গভীর হয় না; সেইজন্য এই সকল জলাশয়ের তলদেশের মাটিতে বিক্ষিপ্ত বীজ হইতে অধিক পরিমাণে চারা গাছ উৎপন্ন হয়। সুতরাং শুষ্ক জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকাইয়া বীজ হইতে চারার উৎপত্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে।

বীজ অঙ্কুরিত হইবার পর উপযুক্ত সময়ে প্রচুর পরিমাণে জল পাইলে এবং মাটি উর্ব্বর হইলে কচুরিপানার গাছ অতি দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং খুব তেজালো হয়; এইরূপ ক্ষেত্রে ইহাদের পাতাগুলি উপর দিকে লম্বা হয়; কিন্তু জলের অভাব ঘটিলে এবং মাটি উর্ব্বর না হইলে উহাদের পাতা সমান্তরালভাবে ছড়াইয়া পড়ে। যে সকল গাছের পাতা উপর দিকে লম্বা হয়, কেবল সেই সকল গাছই মাটি হইতে শিকড় ছিঁড়িয়া জলের উপর ভাসিয়া ওঠে এবং যে সকল গাছের পাতা সমান্তরালভাবে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারা সাধারণতঃ জলের উপর ভাসিয়া ওঠে না; কদাচিৎ খুব দেরীতে ভাসিয়া ওঠে। সাধারণতঃ সকাল ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত জলের উপর কচুরিপানার গাছের ভাসিয়া উঠিবার সময়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে যদিও কচুরিপানা জলজ উদ্ভিদ, ইহা ডাঙ্গাতেও উৎপন্ন হয়; যে সকল জলাশয়ের জল একেবারে শুকাইয়া যায়, সেই সকল জলাশয়ের মাটিতে কেবলমাত্র প্রাণধারণের উপযুক্ত রস থাকিলেই ইহা অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মাটি যতই

তৃতীয় চিত্র



কচুরিপানার বীজ উৎপাদন ও বীজ হইতে বংশ বিস্তারের বিভিন্ন স্তর

(ক) কচুরিপানার পুষ্পদণ্ড পরাগ সংযোগের পর জলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে ; (খ) কচুরিপানার ফল ; **(গ)** বীজ ; (ঘ) বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতেছে ; (ঙ) অঙ্কুরের দ্বিতীয় স্তর ; (চ) অঙ্কুরের তৃতীয় স্তর ; (ছ) কাদায় আবদ্ধ অবস্থায় চারা গাছের বৃদ্ধি ; (জ) চারা গাছ বড় হওয়া এবং উহার কাণ্ড হইতে নূতন গাছের উৎপত্তি।

শুষ্ক হইতে থাকে গাছের শিকড় ততই লম্বা হইয়া মাটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়; এইরূপ ক্ষেত্রে এবং জলাশয়ের পাড়ের মাটিতে যে সকল গাছ জন্মে লাঙ্গল দিয়া তাহাদের উঠাইয়া পচাইয়া বা পোড়াইয়া বা গর্ত্তে পুঁতিয়া মারিয়া ফেলা যায়।

জলাশয় যখন শুকাইয়া যায়, উহার কাদার উপর পশু পক্ষী চরিয়া বেড়াইলে উহাদের পায়ে অনেক বীজ আটকাইয়া যায় এবং ইহার দ্বারা তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও উপযুক্ত আবহাওয়ায় তাহা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন যে, পাখীর পায়ে যদি বীজ আটকাইয়া থাকে, উহা উড়িয়া যাইবার সময় খোলা বাতাস পাইয়া সেই বীজের অঙ্কুর উৎপাদনের শক্তি বাড়ে।

কচুরিপানার দ্বারা দেশের অনিষ্ট

কচুরিপানা আমাদের দেশের যে কত বড় ও কী ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই শত্রু গত ২৮ বৎসর যাবৎ কতপ্রকারে যে আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে কচুরিপানার দ্বারা আমাদের দেশের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা হিসাব করিলে কোটি কোটি টাকায় পরিণত হইবে। মোটকথা কচুরিপানা আমাদের "জীবন মরণ" সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কচুরিপানা কত প্রকারে আমাদের ক্ষতি করিতেছে নিম্নে মোটামুটি ভাবে বলা হইল :—

(ক) কৃষিকার্য্যের অবনতি :—

(১) কচুরিপানার দ্বারা ধানের ক্ষতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হয়। কচুরিপানার ঘনদল ভাসিতে ভাসিতে যখন ধান ক্ষেতে আসিয়া পড়ে তখন ধানের সরু সরু

নরম গাছগুলি উহার আক্রমণ মোটেই প্রতিরোধ করিতে পারে না ; ফলে ধান ক্ষেতের উপর কচুরিপানার ঘন দল বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহার চাপে ক্ষেতের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হইয়া যায় ; অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পাকা আউস ধানও এইভাবে কচুরিপানার দ্বারা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায় ; ইহাকেই বলে 'পাকা ধানে মই দেওয়া।' যে সকল স্থানে প্রতি বৎসর কচুরিপানার দ্বারা এইরূপে ধান ক্ষেত নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, সেই সকল স্থানের কৃষকেরা ধানের চাষ করিতে আর সাহস পান না ; এমন অনেক জমি আছে যাহাতে ধানের চাষ করা ছাড়া আর কোন ফসলের চাষ করা যায় না ; সুতরাং কচুরিপানার উপদ্রবের জন্য এই সকল জমি প্রায় 'পতিত' অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

(২) কচুরিপানা পাটেরও ক্ষতি করে ; দেরীতে পাট বোনার ফলে পাট গাছ যখন ছোট থাকে তখন বন্যার জলের সঙ্গে কচুরিপানার ঘন দল পাট ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া ধানের মতই উহাকে চাপিয়া নষ্ট করিয়া দেয় ; তবে পাট গাছ বড় হইলে উহারা উহাদের শক্ত ডাঁটার দ্বারা কচুরিপানার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে এবং ইহার জন্যই কচুরিপানা পাটের তত বেশী ক্ষতি করিতে পারে না।

(৩) পাট ও ধান ছাড়া কচুরিপানার দ্বারা অন্যান্য বর্ষাকালের ফসলেরও ক্ষতি হয়, যেমন—লঙ্কা, বেগুন, আদা, হলুদ, দেশী শাকসব্জী ইত্যাদি ; যদিও এই সকল ফসল উঁচু জমিতে উৎপন্ন হয়, তথাপি যে বৎসর বন্যা খুব বেশী হয় এবং উঁচু জমি ছাপাইয়া পড়ে, সেই বৎসর বন্যার সঙ্গে সঙ্গে কচুরিপানা ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া এই সকল ফসলেরও ক্ষতি করে।

(৪) আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য জলা জমিতে অনেক প্রকারের ঘাস উৎপন্ন হয়, কচুরিপানার আক্রমণে এই সকল

ঘাসেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয় ; ইহার ফলে পশুখাদ্যের অভাব ঘটে।

(৫) এমন অনেক জমি আছে যাহার উপর কচুরিপানার দল এত ঘন ও বিস্তৃত ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল জমি চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ; বিল অঞ্চলের অনেক জমি এই কারণে পতিত পড়িয়া আছে।

(খ) মৎস্যের ক্ষতি ঃ

যে সকল পুকুরে বা অন্য জলাশয়ে কচুরিপানা ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেই সকল পুকুর বা জলাশয়ের মাছ বড় হইতে পারে না ; কাজে কাজেই মাছের ওজন কম হয় এবং তাহার দামও কম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কচুরি-পানার চাপে অনেক স্থানে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মাছ মরিয়াও যায়।

(গ) ব্যবসা বাণিজ্যের অসুবিধা ঃ

আমাদের দেশে জল-পথেই কৃষিজাত পণ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি পল্লীগ্রামের হাটে বন্দরে কৃষি-জাত পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য জলপথই একমাত্র উপায়। নদী, নালা, খাল ইত্যাদি কচুরিপানার দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে কৃষি-জাত পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করিতে, এমন কি দৈনন্দিন হাট বাজার করিতেও কত অসুবিধা হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কচুরিপানার দল ঠেলিয়া একদিনের পথ যাইতে ২।৩ দিন লাগে ; অতিরিক্ত পরিশ্রম ও খরচের কথা ছাড়িয়া দিলেও পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বাজার পাওয়া যায় না ; ফলে আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট হয়। ইহা ছাড়া সাধারণ কাজের জন্য জলপথে যাতায়াতেরও যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনেক সময়ে কঠিন রোগের জন্য চিকিৎসকও সময় মত আনিতে পারা যায় না; ইহার ফলে রোগী মারা যায়। কচুরিপানা ঠেলিয়া যাইতে সময় লাগে বলিয়া চিকিৎসককে পারিশ্রমিকও বেশী দিতে হয়।

(ঘ) অনেক খাল, নালা, বিল ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে জলপথ হিসাবে সহজে ব্যবহার করা যাইত, কচুরিপানার দ্বারা তাহা এখন একেবারে বুজিয়া গিয়াছে; ইহাতেও যাতায়াতের অসুবিধা খুব বেশী হইয়াছে।

(ঙ) স্বাস্থ্যের অবনতি ঃ

(১) কচুরিপানার দ্বারা আবদ্ধ জলাশয়ের দূষিত জল পান করিতে হইতেছে।

(২) কচুরিপানার ঘন দলের মধ্যে ম্যালেরিয়া বহনকারী মশা ও অন্যান্য রোগের জীবাণুর উৎপত্তি দ্বারা দেশে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে।

(৩) কচুরিপানার আবেষ্টনীর মধ্যে ঘর ও বসতির আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। সাপের প্রাদুর্ভাবও বাড়িয়াছে।

(৪) কৃষিকার্য্যের অবনতির জন্য খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতেছে। এই প্রসঙ্গে মাছের কথাও বলা যাইতে পারে; মাছ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য; কিন্তু কচুরিপানার জন্য পূর্ব্বের মত সহজে মাছ ধরিয়া খাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ইহাতে দেশের লোকেদের পুষ্টি সাধনেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

(৫) কৃষিকার্য্য ও ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতির জন্য আর্থিক কষ্ট যথেষ্ট বাড়িয়াছে, তাহার ফলে উপযুক্ত অন্ন ও বস্ত্রের অভাব ঘটিয়াছে এবং চিকিৎসার ব্যয় বহন করাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং কচুরিপানা আমাদের "জীবন মরণ" সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য দেশে কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা

অন্যান্য দেশে যখন হইতে কচুরিপানা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, তখন হইতেই উহাকে বিনাশ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোনো দেশেই কোনো চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই; তবে উহার ফলে ঐ সকল দেশে কচুরিপানার বিস্তার অনেক পরিমাণে কম হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ক্ষতির পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে।

কোন্ কোন্ দেশে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা ও উহার বিস্তার নিবারণ করা হইয়াছিল ও হইতেছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বলা হইল :—

(ক) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঘন কচুরিপানার দল কাটিয়া উহাকে জলের উপর দিয়া টানিয়া আনিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, কারণ সমুদ্রের লোণাজলে কচুরিপানা মরিয়া যায়; কিন্তু যখন নদীতে প্রবল স্রোত থাকে, কেবল তখনই এইরূপে কচুরিপানা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়ার সুবিধা হয়; ইহা ছাড়া কচুরিপানার দলকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় পথে অনেক কচুরিপানা বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতে আবার নূতন নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া উহা পরিষ্কৃত নদী নালাকে আবৃত করিয়া ফেলে; এই কারণে সেখানে এই উপায়ের দ্বারা কচুরিপানাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা সম্ভবপর হয় নাই।

উপরোক্ত উপায় ছাড়া স্থানে স্থানে বেড়া দিয়া কচুরিপানাকে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল; এবং যদিও এই উপায় কতকটা কার্য্যকরী হইয়াছিল, তথাপি উহার দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে কচুরিপানার

বিস্তৃতি নিবারণ করিতে পারা যায় নাই; আবদ্ধ স্থান হইতে কচুরিপানা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পুনরায় নিজেদের বংশবৃদ্ধি করিয়া জলাশয় ভরিয়া ফেলিত।

বড় বড় নৌকার পশ্চাতে "রোলার" লাগাইয়া ঐ "রোলারের" সাহায্যে কচুরিপানা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছিল; কিন্তু উহার দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। কচুরিপানার গাছের উপর রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া উহাকে মারিয়া ফেলা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল; এবং যদিও এই পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া কচুরিপানা মারিয়া ফেলা যায় বটে, কিন্তু গরু বাছুর প্রভৃতি পশু চরিয়া বেড়াইবার সময় যদি এইরূপ কচুরিপানা (যাহার উপর এই সকল রাসায়নিক পদার্থ ছিটানো হইয়াছে) খায় অথবা উহার দ্বারা দূষিত জল পান করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণনাশ হইবার আশঙ্কা থাকে; এই কারণে ফ্লোরিডা দেশের লোকেরা আইনের সাহায্যে গরু বাছুর প্রভৃতি পশুর অনিষ্টকারী রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেন। যাহা হউক লুসিয়ানা প্রদেশে এইরূপ রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া কচুরিপানা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা বলবৎ আছে; কিন্তু ইহাতেও সেখানে সম্পূর্ণরূপে কচুরিপানা ধ্বংস করা সম্ভবপর হয় নাই। এ স্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই উপায়ে কচুরিপানা ধ্বংস করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। লুসিয়ানাতে এক বিঘা জমির কচুরিপানা ধ্বংস করিতে প্রায় ৮৲ টাকা খরচ হয়।

ফ্লোরিডা দেশে বড় বড় প্রশস্ত নৌকার সহিত দুইটি যন্ত্র লাগাইয়া কচুরিপানা ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। একটি যন্ত্রের দ্বারা কচুরিপানার ঘন দল

কাটিয়া ছিঁড়িয়া উহার সহিত আটকাইয়া যায় ; ঐ যন্ত্রটি হইতে কচুরিপানা বাহির করিয়া তীরে জমা করা যায় এবং আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত কচুরিপানাকে উঠাইয়া তীরে নিক্ষেপ করা যায় ; এইরূপে কচুরিপানাকে তীরে আনিয়া জড় করিয়া উহাকে পচাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই উপায়ে কচুরিপানা ধ্বংস করাও খুব ব্যয় সাপেক্ষ। সংগৃহীত কচুরিপানাকে কেবল, মাত্র এই উপায়ে তীরে উঠাইয়া নিক্ষেপ করিতে সেখানে বিঘা প্রতি ১১৲ টাকা খরচ হইত।

(খ) নদী, খাল ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া ভাসমান কচুরিপানাকে ঐ বেড়ার মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল ; এই সকল বেড়ার মধ্যে যে সকল কচুরিপানা জড় হইয়া আটকাইয়া থাকে, উহাদিগকে তীরে তুলিয়া আনিয়া শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য স্থানীয় লোকদিগকে বাধ্য করা হয় ; এই উদ্দেশ্যে এক গ্রাম্য আইনের বলে গ্রামের মাতব্বরগণ নিজ নিজ এলাকার সক্ষম পুরুষ, স্ত্রীলোক এমন কি বার বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালকদিগকে এই কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছিল যে, এই গ্রাম্য আইনও যথেষ্ট নহে।

(গ) কোচিন চীনেও ব্রহ্মদেশের মত বেড়া প্রস্তুত করিয়া ভাসমান কচুরিপানাকে আটকাইয়া রাখিবার ও উহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভাসিয়া যাওয়া নিবারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল ; এ ক্ষেত্রেও বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবার ভার গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল ; কৃষক, জমির মালিক, প্রভৃতিকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, প্রত্যেক মাসের প্রথম তিন দিন (এবং প্রয়োজন হইলে

আরও বেশী দিন) নিজ নিজ এলাকার কচুরিপানা উঠাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।

(ঘ) আমেরিকার ন্যায় অষ্ট্রেলিয়া দেশেও যন্ত্রের সাহায্যে কচুরিপানা উঠাইয়া তীরে ফেলিবার ও সমুদ্রের লোণাজলে উহাকে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করা ছাড়া ১৯০৮ সালে কোচিন চীনে, ,১৯১৪ সালে শ্যাম দেশে, ১৯১৭ সালে ব্রহ্মদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ১৯২৬ সালে আসামে কচুরিপানা ধ্বংসের জন্য আইন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই সকল আইনের সব বিধি জারী করা সম্ভবপর হয় নাই।

বাংলা দেশে কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা

ইংরাজী ১৯১৪ সালে নারায়ণগঞ্জের ব্যবসা সমিতি কচুরিপানার দ্বারা দেশের নদী, নালা প্রভৃতি ভরিয়া যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্যের কত অসুবিধা হইয়াছে, এবং উহা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িলে ব্যবসা বণিজ্যের জন্য অনেক নদী নালাতে যে নৌকা চলাচল একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িবে এবং তাহার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রভূত ক্ষতি হইবে, সে সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। এই সময় হইতেই সরকারী কৃষি-বিভাগ, জেলা বোর্ড এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ কচুরিপানার বিস্তার নিবারণ ও উহার ধ্বংস কার্য্যে সচেষ্ট হন।

সার হিসাবে কচুরিপানার উপকারিতা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলে, তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে সারে পরিণত করিতে উৎসাহী হইবেন এবং তাহাতে যে কচুরিপানার বিস্তার অনেকটা হ্রাস পাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া

Date.............
Accn. No.............

সার হিসাবে কচুরিপানার মূল্য নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে সরকারী কৃষি-বিভাগ বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ করেন; এই পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে পচা কচুরিপানা এবং কচুরিপানার ছাই উভয়ই উৎকৃষ্ট সার ; এমন কি উপযুক্তভাবে পচানো কচুরিপানা গোবর সার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কচুরিপানার ছাই অন্যান্য কাঠের ছাই অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কচুরিপানার গাছে সোরা জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং ইহার ছাই হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পদার্থ বাহির করা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও কৃষি-বিভাগ পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, কচুরিপানা সংগ্রহ করিয়া, উহাকে শুকাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া, সেই ছাই হইতে সোরা জাতীয় পদার্থ বাহির করা আর্থিক হিসাবে লাভজনক নহে। এমন কি এই সময়ে স ওয়ালেস কোম্পানী নানা স্থান হইতে কচুরিপানার ছাই কিনিয়া উহা হইতে সোরা জাতীয় পদার্থ বাহির করার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যে ছাই কিনিতেন, তাহার সহিত ধূলা, বালি এবং অন্যান্য জিনিষ প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত এবং ইহার ফলে তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছিল।

১৯১৮ সালে গভর্ণমেণ্ট কচুরিপানার ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তখন হইতেই কচুরিপানা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে অল্প বিস্তর প্রচার কার্য্য চলিতেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় স্থানে স্থানে কচুরিপানা উঠাইয়া ফেলা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেণ্টগণের সাহায্যে "কচুরিপানা দিবস" পালন করেন। অনেকেই অতি উৎসাহ সহকারে এই দিবসে কচুরিপানা জল হইতে উঠাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু আবার অনেকে এ বিষয়ে তখন মোটেই মনোযোগ দেন নাই ; তাহার ফলে পরিষ্কৃত স্থান আবার কচুরিপানায় ভরিয়া গিয়াছিল।

কচুরিপানার বিস্তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার এবং উহাকে ধ্বংস করার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৯২১ সালে গভর্ণমেণ্ট একটি "কমিটি" নিযুক্ত করেন ; ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। উক্ত কমিটি কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করেন এবং কচুরিপানা ধ্বংস করিবার কোন কার্য্যকরী প্রণালী আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে উহার জীবন-প্রণালী ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, এই মন্তব্য করেন। উক্ত কমিটি ইহাও বলেন যে, বর্ত্তমানে সমবেত চেষ্টার দ্বারা জল হইতে হাত দিয়া কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে।

১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসী মিষ্টার গ্রিফিফ্থের উদ্ভাবিত পিচকারীর দ্বারা এবং তাঁহারই উদ্ভাবিত "তরল বিষ" ছিটাইয়া কচুরিপানা ধ্বংস করা যায় কিনা সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং পরে এই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলাফল দেখিয়া প্রথমে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই "বিষ" প্রয়োগের দ্বারা কচুরিপানা ধ্বংস করা সম্ভব হইবে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল যে, বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র কচুরিপানা যেরূপ ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এই "বিষ" প্রয়োগের দ্বারা উহা বিনাশ করা সম্ভব হইবে না।

কচুরিপানা সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পুনরায় ১৯২৫ সালে গভর্ণমেণ্ট একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন এবং ১৯২৬ সালে উক্ত কর্ম্মচারী কচুরিপানার ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আইন জারী করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন।

১৯২৫ সালে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কমিটির সুপারিশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বর্গীয় ডাক্তার পল ব্রুলের উপর কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ভার পড়ে এবং এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্যও করেন।

7558

ভারতীয় কৃষি-কমিশনও কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা ও উহার ধ্বংসের জন্য আইন প্রণয়নের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দেন এবং তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পরামর্শ মত ভারতীয় কৃষি মন্ত্রণা সমিতি যখন গঠিত হইবে, তখন সেই সমিতিই এই পরিকল্পনার প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিবেন। পরে কৃষি মন্ত্রণা সমিতি গঠিত হইবার পর উক্ত সমিতি, কটক কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিষ্টার পরিজাকে কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার গবেষণা ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনিও বলেন যে সমবেত চেষ্টার দ্বারা হাত দিয়া কচুরিপানা তুলিয়া ধ্বংস করাই একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা।

১৯৩৬ সালে বাংলা দেশে কচুরিপানা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে পল্লী সংগঠন বিভাগের চেষ্টায় "কচুরিপানা ধ্বংস সপ্তাহ" পালন করা হইয়াছিল।

I.C.E.R.Y., W.B. LIBRARY
Date 15.6.05
Accn. No. 11390
I.C.E.R.Y. Library 23/3, B.C. ... Calcutta

কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার নিবারণ এবং উহা সমূলে ধ্বংসের উপায়

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে, কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি, ও বিস্তার ক্রমশঃ নিবারণ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে হইলে—

(ক) উহার কাণ্ডটিকে এমনভাবে নষ্ট করিয়া বা মারিয়া ফেলিতে হইবে যে, উহা হইতে যেন আর নূতন গাছ উৎপন্ন হইতে না পারে; এবং যদিও ইহার বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণে গাছ উৎপন্ন হয়, তথাপি বীজ হইতে উৎপন্ন একটি

গাছের দ্বারা কত ক্ষতি হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে মনে রাখিয়া উহার বীজ উৎপাদনও নিবারণ করিতে হইবে।

(খ) ইহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভাসিয়া গিয়া সেখানে বংশ বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে আবার অনিষ্ট না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) আমাদের দোষে উহা যেন বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশে (এবং আমাদের দেশেও) কচুরিপানা ধ্বংস করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার পরীক্ষা ও উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে উহাকে উহার জন্মস্থান হইতে (জলই হউক বা ডাঙ্গাই হউক) হস্ত দ্বারা উঠাইয়া উহার কাণ্ডটিকে মারিয়া ফেলাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এই উপায়ের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, সমবেত চেষ্টা ছাড়া কখনও এই কাজে ফল লাভ করা যাইবে না। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসিগণকে একই সময়ে এক জোটে গ্রামের জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে বিধিমতে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে।

(ক) কাণ্ড ও বীজ নষ্ট করিবার উপায়ঃ—

বছরের যে কোনো সময় কচুরিপানা উঠাইয়া উহার কাণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারা যায়; তবে আশ্বিন মাস হইতে শুরু করিয়া বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কচুরিপানা উঠাইয়া ধ্বংস করাই উচিত; কারণ বর্ষার সময় উহার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার অতি দ্রুতগতিতে হয় এবং সেইজন্য বর্ষার সময় উহা ধ্বংস করা খুবই শ্রমসাধ্য কাজ। কিন্তু বীজ উৎপাদন ও কাণ্ড এক সঙ্গে নষ্ট করিতে হইলে আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ ফুল হইতে

বীজ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া, পচাইয়া, গর্ত্তে পুঁতিয়া বা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নিম্নে বলা হইল :—

(১) ছোট ছোট খাল, নালা, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি এবং যেখানে কচুরিপানা বেশী ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই এবং যেখানে কাছাকাছি উঁচু জমি আছে :

জল হইতে কচুরিপানার গাছ, গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি উঠাইয়া আনিয়া প্রথমে একটি উঁচু জমিতে উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। এইরূপে রৌদ্রে শুকাইবার উঁচু জায়গাটি জলাশয় হইতে কিছু দূরে হইলে ভাল হয়, কারণ ঐ জায়গাটি জলাশয়ের অতি নিকটে থাকিলে কচুরিপানার গাছ, কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি কোনো কারণে জলাশয়ে পড়িয়া আবার উহার বংশ বিস্তার করিতে পারে। রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া যাইবার পর শুষ্ক গাছ, কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদিকে একত্রে জড় করিয়া সম্পূর্ণভাবে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, কচুরিপানার কাণ্ডই আমাদের যত অনিষ্টের মূল। সুতরাং কাণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে মারিয়া ফেলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই কাণ্ড রৌদ্রে শুকাইলেও মরে না; এমন কি আগুনে পোড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে ছাই করিয়া না ফেলিলে, জল পাইলে উহা পুনরায় বাঁচিয়া উঠে এবং উহা হইতে নূতন গাছ জন্মায়। সেইজন্য যে সকল শক্ত কাণ্ড একেবারে পুড়িয়া যাইবে না উহাদিগকে ২।৩ হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রণালীতে কচুরিপানা মারিয়া ফেলা ছাড়া উহাকে গাদা দিয়া পচাইতে পারা যায়; প্রথমে উহার একটি স্তর করিতে হইবে এবং উহা ভাল করিয়া চাপিয়া

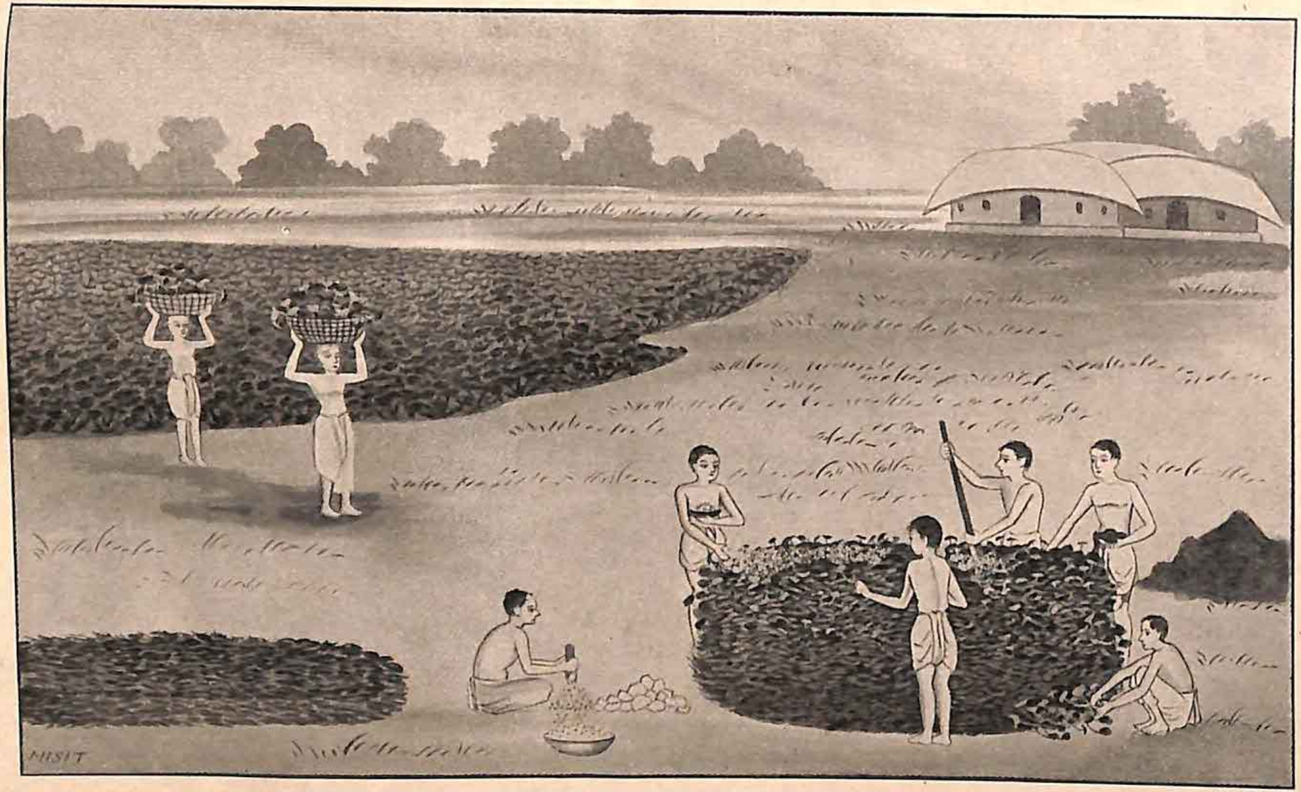
LIBRARY
Date

দিতে হইবে। স্তরের ভিতরে কিছু গোবর ও চূণ দিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যাইবে। চতুর্থ চিত্রে এইরূপ গাদা করিয়া কচুরিপানা পচাইবার প্রণালী দেখনো হইয়াছে।

প্রথম স্তরটি পচিয়া যাইলে উহার উপর আর একটি স্তর করিতে হইবে এবং উহাকেও ভাল করিয়া চাপিয়া উহার ভিতর গোবর ও চূণ দিতে হইবে; এইরূপে একটি স্তরের উপর পর পর নূতন স্তর নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। শেষ স্তরটির উপরে কিছু মাটি চাপা দিলে ভাল হয়। কিছুদিন পরে এই স্তরগুলির আশে পাশে যদি নূতন ২।১টি গাছ জন্মায় উহাদিগকেও স্তরের মধ্যে ঠাসিয়া দিতে হইবে। কেবল মাত্র কচুরিপানার স্তর না করিয়া যদি উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে গোবর ও অন্যান্য ঘাস জঙ্গল ইত্যাদির স্তর করা যায় তাহা হইলে খুব ভাল হয়। এই প্রণালীতে একটি গোবরের স্তরের উপর একটি ঘাস জঙ্গলের স্তর করিতে হয় এবং উহার উপর কচুরিপানার একটি স্তর করিতে হয়; প্রত্যেক স্তর ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হয়; এইরূপে স্তর করিলে উহা পচিয়া উহাদের মধ্যে এত অধিক উত্তাপের সৃষ্টি হয় যে, নূতন গাছ আর জন্মিতে পারে না। এই স্তরগুলি পচিয়া অতি উত্তম সারে পরিণত হয়।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশের পরীক্ষার ফলাফল খুবই শিক্ষাপ্রদ। সেখানে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কচুরিপানাকে ভালরূপে শুকাইয়া এবং উহার সহিত মাটি ও গোবর মিশাইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে এক হাত আন্দাজ পুরু একটি স্তর প্রস্তুত করা হয়; এই ভাবে প্রথম স্তরটির উপর কিছুদিন অন্তর অন্তর পর পর তিন চারিটি স্তর করা হয় এবং শেষের স্তরটি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। মাস খানেক পর এই স্তরের স্তূপটিকে একবার উল্টাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ইহার সর্ব্বাংশে বাতাস লাগিতে পারে এবং

চতুর্থ চিত্র



ডাঙ্গায় কচুরিপানা পচাইয়া সার প্রস্তুত

এইরূপ ওলট পালট করিয়া উহার দ্বারা একটি স্তূপ করা হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষ দিকে উহা সম্পূর্ণরূপে পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়; এই সার ধান ক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১০০/০ মণ হিসাবে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ২।৩ বৎসর ধানের ফসল খুব বেশী হয়। ইহা ছাড়া এই সার ব্যবহার করিলে ধানের কোন রোগ হয় না।

(২) যেখানে কচুরিপানা এমন ঘন ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, উহাকে জল হইতে উঠাইয়া তীরে লইয়া যাওয়া খুবই পরিশ্রম সাধ্য এবং যেখানে উঁচু জমি নাই:

এরূপ ক্ষেত্রে জলের মধ্যে কচুরিপানা পচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঘন এক দল কচুরিপানাকে ভিত্তি করিয়া উহার উপর কচুরিপানার স্তূপের উপর স্তূপ করিতে হইবে। স্তূপগুলি যখন খুব ভারী হইয়া যাইবে, তখন ভিত্তি স্বরূপ কচুরিপানার যে দল ছিল তাহা মাটিতে যাইয়া ঠেকিবে এবং তাহার উপরের স্তরগুলিও জলের নীচে চলিয়া যাইবে; স্তূপ জলের নীচে না থাকিলে উহা পচিবে না। যাহাতে ভিত্তি ও তাহার উপরের স্তরগুলি ভাসিয়া না যায় তাহার জন্য উহার চারিধারে বাঁশের বেড়া দিতে হইবে।

(৩) যেখানে জলাশয় খুব প্রশস্ত এবং কচুরিপানার পরিমাণ ও বিস্তার খুব বেশী (যেমন বড় বড় বিল):

এইরূপ ক্ষেত্রে জলাশয় অর্থাৎ বিলটিকে সুবিধামত ভাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া বাঁশের খোঁয়াড় প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ভাগের কচুরিপানা উঠাইয়া সেই খোঁয়াড়ের ভিতর গাদা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পচাইতে হইবে। খোঁয়াড় প্রস্তুত করা সম্ভব না হইলে এক এক ভাগে একটি বাঁশ পুঁতিয়া

তাহার চারিধারে খড়ের গাদার ন্যায় কচুরিপানার গাদা জলের মধ্যেই করিতে হইবে ; তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই কচুরিপানা পচিতে আরম্ভ করিবে। উপরের পানা সহজে পচে না ; সেই জন্য কিছুদিন পর পর তাহা পচা পানার মধ্যে ঠাসিয়া দিতে হইবে। জলের মধ্যে পচা কচুরিপানার গাদার উপর লাউ কুমড়া ঢেঁড়স প্রভৃতির চাষ করা যায়। পঞ্চম চিত্রে (ক) জলের মধ্যে কচুরিপানা পচাইবার প্রণালী দেখানো হইয়াছে। জলের ভিতর কতকগুলি কচুরিপানা একত্র করিয়া তাহার উপর স্তরে স্তরে আরও কচুরিপানা রাখিলে ৫।৬ জন লোক অনায়াসে উহার উপর দাঁড়াইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উহাকে ভেলার ন্যায় চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এবং চতুর্দ্দিকস্থ কচুরিপানা তুলিয়া স্তূপের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। স্তূপ যথেষ্ট পরিমাণে বড় হইলে উহার মধ্য দিয়া একটি লম্বা বাঁশ চালাইয়া উহাকে যে কোনো স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। কিছু দিন এই অবস্থায় থাকিলে স্তূপের আয়তন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। তখন উহার উপর আরও কচুরিপানা দেওয়া যাইতে পারে। স্থান ও কালভেদে এই উপায়ের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে। পঞ্চম চিত্র (খ)।

(৪) যেখানে কচুরিপানার পরিমাণ অল্প :

এরূপ ক্ষেত্রে কচুরিপানা উঠাইয়া একটি গর্ত্তে পচানোই যুক্তিযুক্ত।

(৫) যেখানে নদী নালাতে প্রবল স্রোত আছে :

এরূপ ক্ষেত্রে কচুরিপানা জড় করিয়া স্রোতের সাহায্যে বড় নদীতে ভাসাইয়া দিলে উহা সমুদ্রে গিয়া পড়িবে এবং সেখানকার লোণা জলে মরিয়া যাইবে। ইহা সম্ভব না হইলে মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া কচুরিপানা আটকাইয়া

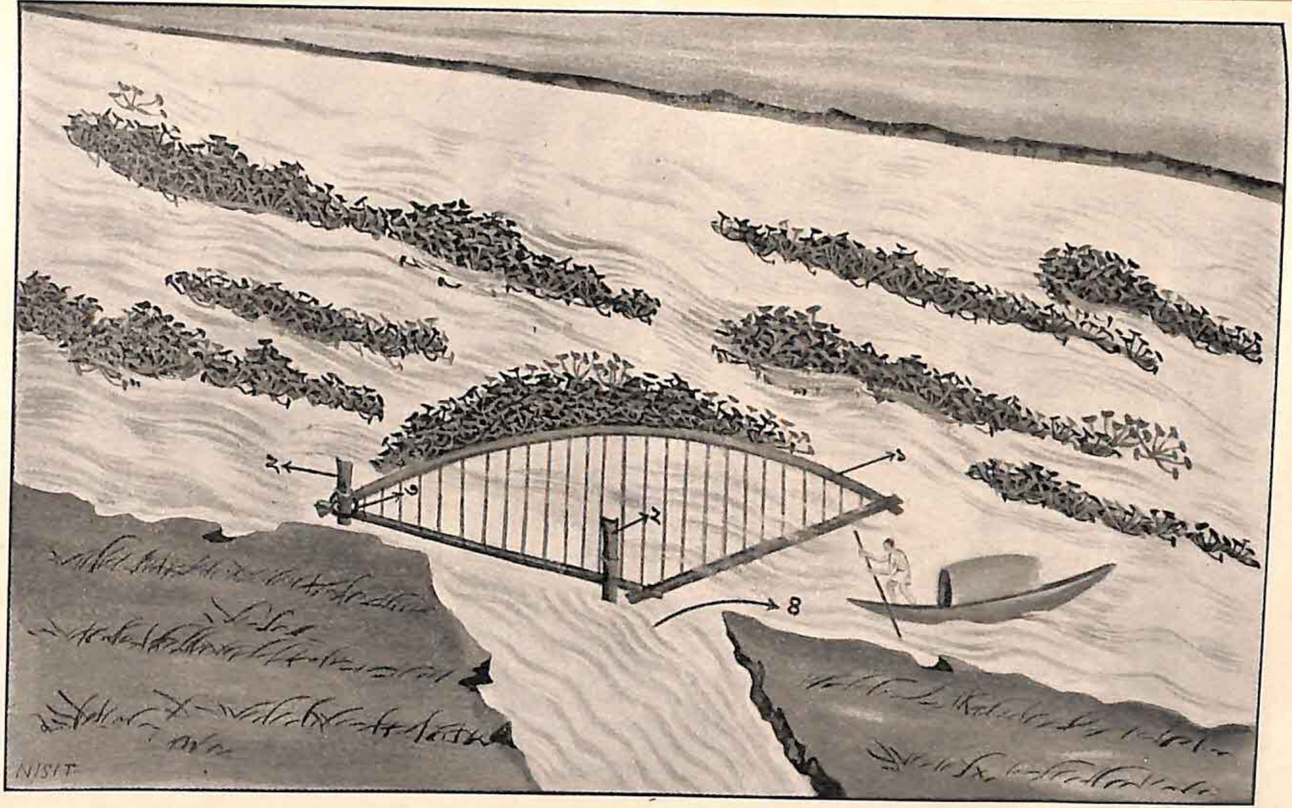


(ক) জলে গাদা করিয়া কচুরিপানা পচাইবার প্রণালী (খ) কচুরিপানার ভাসমান ভেলা

ষষ্ঠ চিত্র



নদীর স্রোতে ভাসমান কচুরিপানা হইতে বেড়া দ্বারা খাল রক্ষা করার প্রণালী



স্রোতের জলে ভাসমান কচুরিপানা হইতে খালকে বেড়া দ্বারা রক্ষা করার সহজ প্রণালী

(১) বাঁশ অথবা অন্য কোন শক্ত হাল্কা জিনিষ দ্বারা প্রস্তুত ভাসমান বেড়া। (২) শক্ত খুঁটি (কাঠের)। (৩) লোহার কড়া। ইহার সাহায্যে বেড়ার এক মাথা একটি খুঁটির সঙ্গে সংযুক্ত আছে। বেড়ার অন্য মাথাটি স্রোতের বেগে ধাক্কা খাইয়া দ্বিতীয় খুঁটির সঙ্গে আটকাইয়া আছে। (৪) নৌকা চলাচলের পথ। এইরূপ বেড়া প্রধানতঃ যেসব খালে জোয়ার ভাটা হয় সেই সকল স্থানে কার্য্যকরী হয়।

রাখিতে হইবে এবং পরে উহা উঠাইয়া পোড়াইয়া বা পচাইয়া ফেলিতে হইবে।

(খ) একস্থান হইতে অন্যস্থানে কচুরিপানা ভাসিয়া আসা নিবারণ:—

কচুরিপানা যখন বড় বড় নদীতে ভাসিয়া যায় তখন উহার দ্বারা তত অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যখন বন্যার সময় উহা ছোট ছোট নদী, নালা, খাল, বিল, ফসলের ক্ষেত, পরিষ্কৃত জলাশয় ইত্যাদিতে প্রবেশ করে তখনই উহার দ্বারা অনিষ্ট হয়। সুতরাং ছোট ছোট নদী, নালা, খাল, বিল, ক্ষেত ইত্যাদিতে উহার ভাসিয়া আসা নিবারণ করিতে হইলে এই সকল জলাশয়ের মুখে অর্থাৎ যে স্থান দিয়া বাহির হইতে কচুরিপানা আসিয়া প্রবেশ করে তথায় বেড়া দিতে হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম চিত্রে দুই প্রকারের বেড়া দেখানো হইয়াছে। আপন আপন জমির আইলে এবং নদী ও খালের জল যেখানে পাড় ছাপাইয়া উঠে সেখানে নদী বা খালের পাড়ে ঘন ধঞ্চে, অড়হর, হিজল প্রভৃতি গাছের বেড়া দিলে কচুরিপানার আক্রমণ অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে এবং ইহা খুব সস্তায় হয়।

(গ) আমাদের দোষে ইহার বংশবৃদ্ধি:

(১) জলাশয় একবার পরিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, উহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং উহার উপর ২।১ টি কচুরিপানা উৎপন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। রাস্তা, ঘাট, মাঠ ইত্যাদিতে একটি কচুরিপানার গাছ দেখিলেই উহাকে ভীষণ শত্রু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া গর্ত্তে ফেলিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(২) মাছ ধরিবার জন্য বেড়া দেওয়ার প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই বেড়ায় কচুরিপানা আটকাইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ বংশ বিস্তার করে।

(৩) কচুরিপানার চাপান দিয়া পাট পচাইবার প্রথা একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে ; ইহাতেও কচুরিপানার বংশ বিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা হয়।

(৪) খাল, নদী, নালার পাড়ের গাছের ডাল, বাঁশ, জঙ্গল ইত্যাদি জলে পড়িলে উহাতে কচুরিপানা আটকাইয়া রাখে এবং এইরূপ আটকানো কচুরিপানা অতি শীঘ্রই বংশ বৃদ্ধি করিয়া জলাশয় ভরিয়া ফেলে ; এ দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) খাল, নালা ইত্যাদিতে নৌকা ডুবাইয়া রাখিলেও সেই নৌকার গায়ে কচুরিপানা আটকাইয়া থাকে, ইহাতেও উহার বংশ বিস্তার হয়।

উপরোক্ত উপায়গুলির দ্বারা কচুরিপানা ধ্বংস করা যে খুবই শ্রমসাধ্য কাজ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু ইহা ব্যতীত যখন অন্য কোন সহজ উপায় নাই, তখন বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিয়াই ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের বাড়ীতে বিপদ উপস্থিত হইলে সে বিপদ যতই কঠোর হউক না কেন, নিজেদিগকেই যেমন সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ কচুরিপানার দ্বারা আমরা যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি সে বিপদের হাত হইতে আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই মুক্ত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এই পরিশ্রমের ফলে কচুরিপানার উপদ্রব হইতে আমরা নিষ্কৃতি ত পাইবই, তাহা ছাড়া ইহা হইতে প্রস্তুত সারের দ্বারা আমাদের জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুবই বাড়িবে ;

সুতরাং এই পরিশ্রম যতই কঠোর হউক না কেন ইহা কখনও বিফলে যাইবে না।

কচুরিপানা আইনের মোটামুটি কথা

১। কোনো ব্যক্তি নিজে কিম্বা তাঁহার পক্ষের কোনো ব্যক্তির দ্বারা বাংলা দেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের মধ্যে কচুরিপানা আনিতে পারিবেন না।

২। কোনো ব্যক্তি নিজে কিম্বা তাঁহার পক্ষের কোনো ব্যক্তির দ্বারা কচুরিপানা বিক্রয় করিতে পারিবেন না, কিম্বা বিক্রয়ের জন্য উহা রাখিতে পারিবেন না।

৩। কোনো ব্যক্তি তাঁহার বাগানে, পুকুরে কিম্বা কোনো আধারে কচুরিপানা উৎপাদন করিতে পারিবেন না।

৪। কোনো ব্যক্তি নিজে কিম্বা তাঁহার পক্ষের কোনো ব্যক্তির দ্বারা কচুরিপানা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজের জমি, বাড়ী বা জলাশয় হইতে নিজের অন্য জমি, বাড়ী বা জলাশয়ে উহাকে স্থানান্তরিত করিতে বা ভাসাইয়া দিতে পারিবেন না। উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য অন্যের জমি, বাড়ী বা জলাশয়ে স্থানান্তরিত করিতে বা ভাসাইয়া দিতে হইলে, পূর্ব্বেই সেই জমি, বাড়ী বা জলাশয়ের দখলকারীর অনুমতি লইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী কোনো জমি, বাড়ী বা জলাশয়ে কচুরিপানা স্থানান্তরিত করিতে বা ভাসাইয়া দিতে হইলে জেলার কালেক্টার বা তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে।

৫। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট উপযুক্তভাবে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আদেশ দিতে পারেন যে, কোনো নির্দ্দিষ্ট

সময়ের পরে কোনো নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের কোনো ব্যক্তি তাঁহার দখলভুক্ত কোনো জমি, বাড়ী বা জলাশয়ে কচুরিপানা রাখিতে পারিবেন না। এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবার পর উক্ত অঞ্চলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার দখলভুক্ত জমি, বাড়ী বা জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া ফেলিতে বা ধ্বংস করিতে হইবে। যদি উক্ত অঞ্চলের কোনো ব্যক্তি উক্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহার দখলভুক্ত জমি, বাড়ী বা জলাশয় হইতে কচুরিপানা তুলিয়া না ফেলেন বা বিনাশ না করেন, তাহা হইলে কালেক্টারের আদেশপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রয়োজন মত লোকজন সহ উক্ত জমি, বাড়ী বা জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া উক্ত জমি, বাড়ী বা জলাশয় হইতে কচুরিপানা তুলিয়া ফেলিবার বা ধ্বংস করিবার জন্য আবশ্যক মত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন; এবং ইহার জন্য যাহা খরচ হইবে তাহা উক্ত জমি, বাড়ী বা জলাশয়ের দখলকারী ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী দাবী হিসাবে আদায় করা হইবে।

৬। যদি কাহারও জমির, বাড়ীর বা জলাশয়ের পাড় হইতে গাছ, গাছের ডাল, জঙ্গল, ঝোপ, ঝাড় ইত্যাদি নদী, নালা, ডোবা, পুকুর, বিল, খাল, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়ে ঝুলিয়া পড়িয়া, কিম্বা জলাশয়ে উৎপন্ন হইয়া কোনো স্থানে কচুরিপানা আছে কিনা তাহা দেখিবার কিম্বা ধ্বংস করিবার অসুবিধা জন্মায়, তাহা হইলে কোনো আদেশপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বিজ্ঞাপন দিয়া নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের এইরূপ জমি, বাড়ী বা জলাশয়ের দখলকারিগণকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধিমতে এই সকল গাছ, জঙ্গল, ঝোপ, ঝাড় ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন। যদি উক্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী কেহ গাছ, জঙ্গল, ঝোপ, ঝাড় ইত্যাদি কাটিয়া না ফেলেন তাহা হইলে আদেশ

প্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রয়োজন মত লোকজন সহ তাঁহার জমি, বাড়ী ও জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। ইহার জন্য যাহা খরচ হইবে, তাহা জমি, বাড়ী বা জলাশয়ের দখলকারী ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী দাবী হিসাবে আদায় করা হইবে।

৭। কচুরিপানা কোনো স্থানে আছে কিনা এবং কোনো স্থান হইতে নির্দ্দেশ মত উহা তুলিয়া ফেলা বা ধ্বংস করা হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত কর্ম্মচারী প্রয়োজন মত লোক জন সহ যে কোনো সময়ে নির্দ্দিষ্ট এলাকার যে কোনো জমি, বাড়ী বা জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

৮। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত নিয়ম অনুসারে কালেক্টার কচুরি-পানার গতি রোধ করিবার বা উহাকে ভাসাইয়া দিবার জন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট এলাকার নদী, নালা, খাল, হ্রদ, পুকুর, জলা, বা বিল প্রভৃতি জলাশয়ের মধ্যে কিম্বা উহাদের পাড়ে বেড়া, খোঁয়াড় প্রভৃতি, এমন কি ভাসমান বেড়া দিবার এবং উহাদিগকে রক্ষা করিবার অনুমতি দিতে পারেন বা ঐ সকল নির্ম্মাণ করিতে বা রক্ষা করিতে পারেন। এই সকল বেড়া, খোঁয়াড় প্রভৃতি কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না। কোনো আদেশ প্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই সকল বেড়া, বাঁধ, খোঁয়াড় প্রভৃতির পরিকল্পনা এবং উহাদের খরচের হিসাব প্রস্তুত করিতে পারেন এবং উহা প্রস্তুত হইবার পর এই পরিকল্পনা অনুয়ায়ী বেড়া, বাঁধ, খোঁয়াড় প্রভৃতি প্রস্তুত হইলে যাঁহারা উহাদের দ্বারা উপকৃত হইবেন, তাঁহাদের নাম ও প্রত্যেককে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেড়া, বাঁধ ও খোঁয়াড় প্রস্তুতের ও উহাদের রক্ষা করিবার খরচ বাবদ কি অংশ দিতে হইবে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রকাশ করিবেন, এবং এই সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে আপত্তি গ্রহণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে এই সম্বন্ধে আপত্তি বিবেচনা করিয়া কালেক্টার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যয় এবং উহার দ্বারা প্রত্যেক উপকৃত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যয়ের কি অংশ বহন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা মত অদল বদল করিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর উহার খরচ কালেক্টার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে সরকারী দাবী হিসাবে আদায় করার ব্যবস্থা করিবেন।

৯। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কোনো অঞ্চলের ব্যক্তিগণকে কোনো প্রকারের জলাশয়ের ১০০ ফিটের মধ্যে অবস্থিত জমির চারিধারের আইল নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেরামত করিবার জন্য আদেশ দিয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সাধারণ ভাবে বিজ্ঞাপন দিতে পারিবেন।

১০। কোনো এলাকাকে কচুরিপানার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কালেক্টার যদি মনে করেন যে, কোনো জমিতে ধঞ্চে বা অন্য কোনো গাছের বেড়া দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া বেড়ার বিবরণ সহ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট উপায়ে উহা প্রকাশ করিবেন এবং ঐ সম্বন্ধে আপত্তি বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য যথাবিহিত ভাবে বেড়া দিবার লিখিত আদেশ দিতে পারিবেন।

১১। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কচুরিপানা স্থানান্তরিত বা ধ্বংস করিতে হইবে।

১২। এই আইনের কোনো ধারা অমান্য করিলে প্রথম অপরাধের জন্য ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা উহা অনাদায়ে এক মাস পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে এবং দ্বিতীয় ও পরবর্ত্তী

অপরাধের জন্য ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা অনাদায়ে দুই মাস পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে।

কচুরিপানার অন্যান্য ব্যবহার

কচুরিপানাকে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প সংক্রান্ত কোনও কাজে লাগাইতে পারা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে অন্যান্য দেশে অনেক দিন হইতে অনেক প্রকারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। কচুরিপানা শুকাইয়া উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে পারা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বহুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; যদিও সেই পরীক্ষার ফলে যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার নমুনা দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল যে, কচুরিপানা হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু শুষ্ক কচুরিপানা হইতে কাগজ প্রস্তুতের উপাদান এত কম পাওয়া গিয়াছিল যে, তাহা ব্যবসা হিসাবে লাভজনক হইবে বলিয়া সন্দেহ ছিল। যাহা হউক বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ বর্ত্তমানে কচুরিপানার শুষ্ক পাতা ও ডাঁটা হইতে সাধারণ কাগজ এবং জমাট বা পুরু কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে পুনরায় পরীক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষার ফলাফল আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের পরীক্ষার ফলে ইতিমধ্যেই জানা গিয়াছে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহযোগে ইহা হইতে শক্ত ও পুরু কাগজ (পেষ্ট বোর্ড) প্রস্তুত হইতে পারে। জল ঢোকে না এইরূপ পেষ্টবোর্ড প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, সে বিষয়েও পরীক্ষা চলিতেছে ; ইহা সফল হইলে, বর্ত্তমানে চায়ের সিন্দুক প্রস্তুতের জন্য যে কাঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিবর্ত্তে এই পেষ্টবোর্ড ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। এমন পেষ্টবোর্ড প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিনা যাহার দ্বারা টুপি প্রস্তুত হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে।

জ্বালানী কাঠের অভাবে পল্লীগ্রামের অনেকেই শুষ্ক কচুরিপানা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন।

যখন পশু খাদ্যের অভাব ঘটে তখন পল্লীগ্রামের অনেকে কাঁচা কচুরিপানা গরুকে খাইতে দেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, ক্ষুধার তাড়নায় গরু ঘন কচুরিপানার দলের মধ্যে নামিয়া কচুরিপানা খাইতেছে। কিন্তু পশু খাদ্য হিসাবে কচুরিপানার কোন গুণ নাই; বরং ইহাতে উহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এ পর্য্যন্ত অন্যান্য কাজে কচুরিপানার ব্যবহার সম্বন্ধে যত চেষ্টা হইয়াছে তাহার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সার হিসাবেই ইহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

কচুরিপানা ধ্বংসের জন্য প্রচার কার্য্য

কেবল মাত্র আইনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কচুরিপানাকে বিনাশ করা সম্ভব হইবে না। উপযুক্ত প্রচার কার্য্যের দ্বারা এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াইতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, অনেকদিন হইতেই ত কঠোর পরিশ্রম সহকারে জলাশয় ও জমি হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু কচুরিপানা ত মরিতেছে না, যেমন ছিল তেমনই আছে, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার উত্তরে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ একই সময়ে এক যোগে সকল স্থানে কচুরিপানা জল বা জমি হইতে উঠাইয়া ধ্বংস করা হয় নাই; ইহার ফলে যাঁহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া নিজেদের জলাশয় বা জমি হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহা পরিস্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ অন্যান্য স্থান হইতে কচুরিপানা ভাসিয়া আসায় তাঁহাদের পরিস্কৃত স্থান আবার কচুরিপানায় ভরিয়া গিয়াছে। এই জন্য যতদূর সম্ভব একই সময়ে এক জোটে সকলকে এমন ভাবে নিজ নিজ এলাকার কচুরিপানা পরিস্কার

করিতে হইবে যাহাতে উহা অপরিষ্কৃত স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়া পরিষ্কৃত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারে।

কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি, বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে রীতিমত জ্ঞানের অভাবে উপযুক্ত প্রণালীতে উহাকে ধ্বংস করা বা উহার বিস্তার নিবারণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। অনেকেই জানেন না যে, কচুরিপানার কাণ্ড হইতেই উহার জন্ম ও বৃদ্ধি হয় এবং একটি কচুরিপানা কোথাও পড়িয়া থাকিলে উহা হইতে বহু পানার জন্ম হইয়া সকল পরিশ্রম ব্যর্থ করিয়া দেয়। সুতরাং কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার সম্বন্ধে এবং ঠিক কোন সময়ে উহাকে উঠাইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি প্রণালীতে উহার কাণ্ড সম্পূর্ণ রূপে মারিয়া ফেলা যায় এবং কি ভাবে উহার বংশ বৃদ্ধি নিবারণ করা যায় তাহা জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই এই কাজের ভার লইতে হইবে; এবং প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইতেছে; কচুরিপানা ধ্বংস করাই পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রথম ও প্রধান কাজ হইবে। প্রত্যেক গ্রামবাসীকে সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, একটি কচুরিপানার গাছ থাকাও যা, "দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষাও তা।"

কচুরিপানার ছড়া

(পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়)

১

বাংলা দেশের দুঃখু এতো
জানিস্ কিসের তরে ?
কচুরিপানায় নদী পুকুর
ফসল নষ্ট করে।

২

জমির উপর কচুরিপানায়
ফসল করে মাটি,
পুকুর ডোবায় কচুরিপানায়
ম্যালেরিয়ার ঘাঁটি।

৩

নৌকা চলার পথ মেরে দেয়
খালে নদীতে এসে,
কচুরিপানায় করলো কাহিল
সোনার বাংলা দেশে।

৪

মাছ খেয়ে যে বাঁচবে লোকে,
ব্যবসা করবে জেলে—
সে গুড়েতেও বালি রে ভাই
কচুরিপানা এলে।

৫

এক কচুরিপানায় মোদের
যায় রে স্বাস্থ্য সুখ,
এই কচুরিপানায় মোদের
দেশের এতো দুখ।

৬

খাদ্য মাটি, স্বাস্থ্য মাটি
নষ্ট দেশের ধন,
কচুরিপানা নাশ ক'রতে
কর রে সবাই পণ।

৭

বর্ষাকালেই কচুরিপানার
হয় যে ভীষণ বাড়,
বর্ষাকালের আগেই সবাই
ধ্বংস করো ঝাড়।

৮

একটি একটি ক'রে পানা
তুলে জলের থেকে
শুক্‌নো ক'রে পুড়িয়ে ফেলো
উঁচু ডাঙ্গায় রেখে।

৯

জলের তলায় কচুরিপানার
থাকলে একটি মূল,
অল্পদিনেই ছেয়ে যাবে;
ক'রোনা ভাই ভুল।

১০

গোড়া সমেত তুলতে হবে
মনে রেখো সবে,
নইলে আবার অল্পদিনেই
বংশ বৃদ্ধি হবে।

১১

একটি গোড়া থেকে শোনো
কচুরিপানার বাড় ;
চার মাসেতে আধ বিঘাতে
ভরায় পানার ঝাড়।

১২

কচুরিপানার শক্ত গোড়া—
চরম জেনো তাই ;
পুড়িয়ে কিম্বা শুকিয়ে তাকে
মাটিতে পোঁতো ভাই।

১৩

জলের মাঝেও গাদা ক'রে
কচুরিপানা যতো—
বিনাশ করা যায় যে রে ভাই
পচিয়ে ঠিক মতো।

১৪

কচুরিপানা শুকনো ক'রে
পুড়িয়ে করো খার,
কচুরিপানাও ধ্বংস হবে,
জমির হবে সার

১৫

কচুরিপানার ফুলের বীজেও
বংশ বৃদ্ধি করে ;
পাঁচ ছ' বছর জলের তলায়
বীজ তবু না মরে।

১৬

ফুল থেকে বীজ হয় জেনো ভাই
কার্ত্তিক থেকে মাঘে ;
তাই বলি ভাই তুলিতে পানা
ঐ সময়ের আগে।

১৭

ফুল থেকে বীজ প'ড়লে জলে
তুলেও যে লাভ নাই,
সেই বীজেতেই কচুরিপানায়
আবার যা কে তাই।

১৮

ডাঙ্গার উপর কচুরিপানা
রাখলে গাদা ক'রে
চোখ্ রেখো ভাই, আবার না তা
জলের দিকে সরে।

১৯

ধানের ক্ষেতে, ঝোপে ঝাড়ে,
জলে কি কাদায়
থাক্‌লে পরেই বাড়বে আবার—
করবি হায় হায়।

২০

আসল কথা মনে রেখো
কচুরিপানার ঝাড়;
বিনাশ করেও নিস্তার নেই—
রক্ত বীজের ঝাড়।

২১

কচুরিপানা তুলে ফেলেও
রাখতে হবে চোখ;
দেখ্‌তে পেলেই ধ্বংস করা,
হয় যেন এই রোখ।

২২

কচুরিপানার ঝাড় যদি যায়
নদীর জলে ভেসে
লোনা জলে মরবে সে-সব
সাগর মাঝে এসে।

২৩

বড় নদীর জলের স্রোতে
যে সব পানা ভাসে,
খুব সাবধান থেকো সবাই
খালেতে না আসে।

২৪

নৌকা চলার পথ বাঁচিয়ে
নদী খালের মুখে
বেড়া দিয়ে রেখো পানায়
না যেন যায় ঢুকে

২৫

ফসল ক্ষেতে ঢুক্‌লে পানা
যায় ফসলের জান্ ;
ধঞ্চে কিম্বা অন্য বেড়ায়
বাঁচাও ক্ষেতের ধান।

২৬

পাট পচাবার তরে কভু
জাঁক দিও না পানা
সেই পানাতেই দেবে আবার
বিল পুকুরে হানা।

২৭

পানার বেড়া দিও না ভাই
মাছ ধরবার তরে,
সেই পানাতেই আবার শেষে
মারবে তোমায় ধরে।

২৮

খালে বিলে জমিতে যার
কচুরিপানা ভাসে,
দুধ দিয়ে সাপ পোষে সে তো
মরণ রাখে পাশে।

২৯

নিজের নিজের জমির পানা
নিজেই করো শেষ,
সবাই যে যার কাজ করো ভাই
হবেই সুখের দেশ।

৩০

আপন বিপদ আপনা বিনা
দূর করে কি পরে ?
দেশের আপদ বিপদ যত
দশেই বিদায় করে।

৩১

আয়রে বুড়ো, আয়রে যুবক,
আয়রে ছেলের দল।
কচুরিপানা দ'লতে হবে
চাই সকলের বল।

৩২

মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো—
যার যতোটা সয়,
খাটতে হবে ক'রতে দেশের
কচুরিপানা ক্ষয়।

৩৩

এমন কোন কাজ নাই, যা
হয় না দশে মিলে,
কচুরিপানা ক'দিন থাকে
সকলে হাত দিলে ?

৩৪

কচুরিপানা নাশ না ক'রে
বাড়তে দিলে পরে,
কচুরিপানাই থাকবে দেশে
মানুষ উজাড় ক'রে।

৩৫

তাই বলি ভাই সবাই মিলে
শপথ করো আজ—
কচুরিপানার বংশ বিনাশ
করাই প্রথম কাজ।

৩৬

দেশের দশের শত্রু সে জন
করবে না যে পণ
কচুরিপানার মতোই জেনো
সেও যে রে দুষ্‌মন্‌।

৩৭

গ্রামের সবাই, দেশের সবাই
মিলে একই কালে,
শেষ করো ভাই কচুরিপানা
জমি পুকুর খালে।

৩৮

সবার তরে সবাই মিলে
পণ করো ভাই আজ
কচুরিপানা উজাড় ক'রে
ক'রতে দেশের কাজ।

৩৯

নিজের কাজ যে নিজে করে
সহায় ভগবান ;
পরিশ্রমের বিনিময়েই
পাবোরে তাঁর দান।

৪০

আনতে হবে স্বাস্থ্য সুখ আর
দেশের মুখে হাসি ;
তবেই প্রমাণ হবে কেমন
দেশকে ভালোবাসি।

Printed by N. C. Roy at The Imperial Art Cottage, 1-A, Tagore Castle Street, Calcutta and Published by Barendra Nath Mitra from 175A, Raja Dinendra Street, Calcutta.